তোর দুধমাখা ভাত বিড়ালে খায়

রশীদ হায়দার

ফেব্রুয়ারি ২০০৫ বইমেলায় প্রকাশিত ‘দাউদের নির্বাসনের কবিতা’র শেষ প্রচ্ছদে যে ‘এপিটাফ’ মুদ্রিত হয়েছে, সেটিই আগে উদ্ধৃত করি।

‘যে-দেশে আমার মৃত্যুর অধিকার ছিল
সেই দেশ থেকে নির্বাসিত আমি

এই দেশে, বিদেশ বিভুঁইয়ে
অভুক্ত দেহমনে
বেঁচে আছি, ক্ষুধার্ত প্রাণ; কিমাশ্চর্য বাঁচা!

আমার মৃত্যুর পরে লিখে দিও
জননী জন্মভূমি ছেড়ে অচেনা নগরে তার
মৃত্যু হয়েছিল।

মূলত সে কবি, তারও আকাঙ্ক্ষা ছিল
স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সাম্য, ছিল স্বপ্ন
বিজয়ী যোদ্ধার মতো

প্রথম লিখন ২৮/৯/১৯৮৩ কলকাতা
দ্বিতীয় লিখন : ২০/১০/২০০৪, বার্লিন, জার্মানি

দাউদ, দাউদ হায়দার ওরফে খোকনের মৃত্যু সম্পর্কিত এই কবিতাটি দিয়েই কেন লেখা শুরু করলাম? ১৫.৩.০৫ তারিখে কলকাতা থেকে ফেরার পথে সারা রাস্তায় বারবার মনে পড়েছে, খোকন, খোকনরে, আবার তোর সাথে কবে দেখা হবে, আবার পাঁচ ভাই কবে একত্র হবো? দীর্ঘ সাতাশটি বছর পর আমরা একত্র হলাম, কিছুক্ষণ পর বিচ্ছিন্ন হলাম। কলকাতায় আরো দু’দিন থাকার পর তুই উড়ে গেলি বার্লিনে, আমরা বোন ও ভাইয়েরা চলে এলাম ঢাকা, বাংলাদেশে, যে বাংলাদেশে তুই আসিসনি সাতাশটি বছর, আর কবে আসতে পারবি তাও জানা নেই, সত্যিই কি আর আসতে পারবি? মৃত্যু অনিবার্য, তুই আমি কেউই থাকবো না,

বাম থেকে বসা মাকিদ, মা রহিমা খাতুন, শিশু হেমা, রশীদ। দাঁড়িয়ে বাম থেকে জাহিদ, জিয়া, দাউদ

থাকলেও থাকতে পারে নামটি। কিন্তু সেটা কোথায়? প্রত্যাশিতভাবেই আমরা থাকবো বাংলাদেশেরই নির্দিষ্ট কোনো মাটিতে। কিন্তু তোর কোথায় তা তোর আদরের ভাস্তিভাস্তেরা, আপনজনেরা হয়তো খুঁজে পাবে না। তোর ওই 'এপিটাফ' তো দুই জায়গায়। ২১ বছরের ব্যবধানে দ্বিতীয়বার লেখা, কলকাতা যতোই ঘরের কাছে হোক, বিদেশ তো? আর জার্মানির বার্লিন? আরেক মহাদেশ। বহু, বহুদূর!

২.

দাউদ সর্বশেষ বাংলাদেশে এসেছিলো ১৯৭৮ সালে, আগস্টে। দেশ থেকে ভারতে চলে যেতে হয় ১৯৭৪ সালের মে মাসে। চলে যাওয়ার মূলে আছে একটি কবিতা। এই কবিতায় সব ধর্মের মানুষেরই ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগার কিছু উপাদান ছিলো বলে ওর বিরুদ্ধে মোল্লা মৌলবীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সরকার পরিস্থিতির কারণেই ওকে জেলে পাঠান। জেল থেকে বেরিয়ে একটা রাত, মাত্র একটা রাত মা'র কোলের মধ্যে ঘুমিয়ে পরদিন কলকাতা চলে যায়।

'৭৪-'৭৮ সালের মাঝে বারকয়েক দেশে এসেছে, ১৯৭৬-এর ফেব্রুয়ারিতে পাবনায় গিয়েওছিলো একবার। খোকন সেই সময়ই আমাদের বিরাট পুকুরের উত্তর-পশ্চিম কোণায় যে সেগুনগাছটি লাগিয়েছিল সেই গাছ এখন আকাশকে বাতাস দেয়। ওই গাছটির কথা খোকন মাঝে মাঝে বলে। কতো বড় হয়েছে? যেন সন্তান। জন্মদাতা পিতা সন্তান বেঁচে আছে জানে। কিন্তু সে এখন কতো বড় জানে না, সেই জানার আগ্রহের কথা জেনেই কয়েক বছর আগে পাবনার বাড়ি, বাড়ির লোকজন, ঢাকার সমস্ত নিকট আত্মীয়স্বজন এবং ওই সেগুনগাছটির ভিডিও করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কলকাতায়। জানি, খোকন সে ভিডিও দেখেছে বার্লিনে গিয়ে। দেখেছে এবং কেঁদেছে সে খবরও অন্যের মাধ্যমে পরে জেনেছি।

খোকন সবচেয়ে বেশি কেঁদেছে আমার বড় মেয়ে হেমার বিয়ের ভিডিও দেখে। হেমা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের প্রথম সন্তান। আমরা তিন মায়ের ১৪ ভাইবোনের ওই এক হেমা। চাচা-ফুফুদের আদরে-আহ্লাদে বড় হতে থাকে। এর মধ্যে খোকনের আদর-আহ্লাদ বেশিই বলবো। কারণ খোকন হেমার কাকু নয়। ছেলে। আমার দুই মেয়েই আর সব ভাইকে কাকু সম্বোধন করে। শুধু খোকনকে 'খোকন ছেলে'। হেমাকে খোকনই শিখিয়েছিল বলতে। সেই থেকে খোকন ওর কাকু হলো না। ১৫ মার্চ, ২০০৫, কলকাতার হাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রিটে

বাম থেকে দাউদ, জিয়া, রশীদ, জাহিদ, মাকিদ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গেস্ট হাউস থেকে জিয়া ভাই, হেমা, হেমার মেয়ে রায়া ও আমি যখন বিদায় নিচ্ছি, তখন হেমাকে জড়িয়ে ধরে খোকন যে স্নেহ উজাড় করে দিল তার মধ্যে আমি স্পষ্ট শুনলাম মা! মা! তখন ওর চোখ ভেজা এবং কিছুটা লাল। হেমাকে মা ডেকেই খোকন মা ডাকার অপূর্ণ সাধ পূরণ করতে চায় বুঝি, কারণ ৬ জানুয়ারি ১৯৭৬, মার মৃত্যুর সময় খোকন ঢাকায় ছিলো না। কলকাতায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য নিয়ে অনার্স পড়ছে। মাকে শেষ দেখা দেখলো না। সেই কষ্ট খোকন এখনও বুকে ধারণ করে রেখেছে।

খোকনের 'খোকন ছেলে' নামে একটি কবিতা আছে।

ছবি: রূপালী হাসান

একটি ভাই ঘরছাড়া বাদ বাকি দেশে-

'কী জানি কেমন কাটে বিদেশ পরিবেশে
কোথায় দিনযাপন কোথায় রাত্রি
শুনেছি আজ লন্ডন কাল প্যারিস যাত্রী'

ভাবেন অনুজঅগ্রজ এমনকি হেমা ক্ষমা
রশীদের দুই মেয়ে। অবশ্য মাকিদের নিরুপমা
সবে দেড় মাস। জাহিদের শ্রীমান বর্ষ
প্রাকৃতিক আনন্দহর্ষে
ঘোরেফেরে, কথা বলে, জানে না সে, কে তার
খোকন ছেলে, কোথায় ঘরবাড়ি, কোথায় সংসার

২০-১২.১৯৮৮

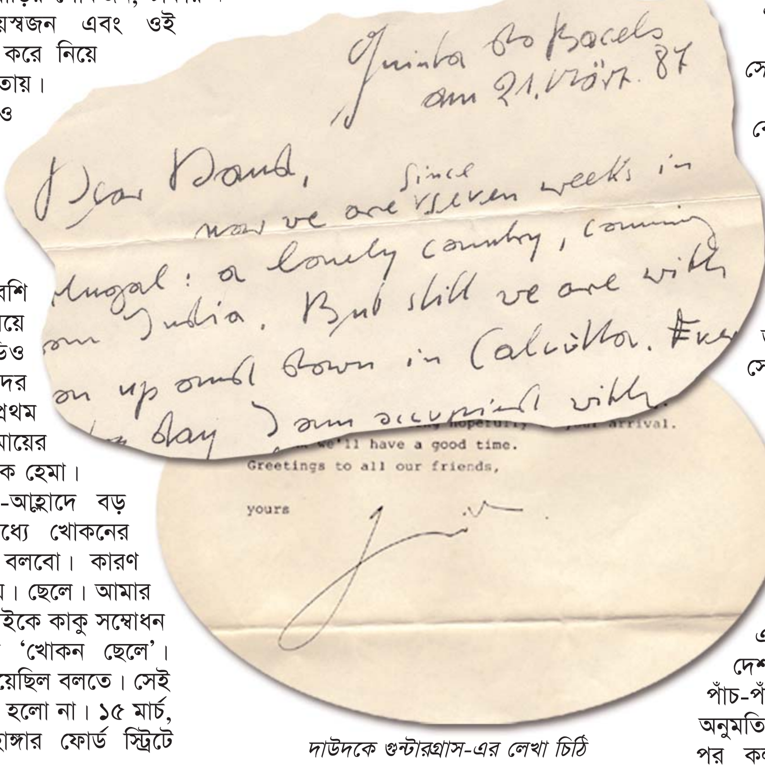

Quinta do Bacelo
am 21. Nov. 87

Dear Daud, since
now we are seven weeks in
...ugal: a lovely country, coming
... India. But still we are with
... up and down in Calcutta. Every
day I am occupied with ...
... hopefully ... arrival.
... we'll have a good time.
Greetings to all our friends,

yours

দাউদকে গুন্টারগ্রাস-এর লেখা চিঠি

আমরা চিৎকার দিয়ে ডেকে বলি, তোর স্ত্রী-সন্তানে সংসার না হলেও দেশে ঘরবাড়ি তো আছে; তুই আয়, আয়, ঘরে আয়, ডাকতে ডাকতে আমাদের মনে পড়ে যায় সেই ছড়ার সেই শেষ চরণ : 'তোর দুধমাখা ভাত বিড়ালে খায়'। জানি, ও আসতে পারে না, পারবে না। দেশের জন্যে যতোই মাথা কুটে মরুক, নিজেকে নিঃশেষ করে দেশকে ভালোবাসুক; না, দেশে আসার অনুমতি নেই। যেন দেশে এলেই দেশের সমূহ বিপদ। যেন দেশে শান্তিসুখের নহর বইছে, একমাত্র খোকন এলেই অশান্তিতে দেশ ছেয়ে যাবে। ১৯৭৮ সাল-পরবর্তী পাঁচ-পাঁচটি সরকার, কেউ ওকে আসার অনুমতি দিলো না। পুরোপুরি নির্বাসিত হবার পর কলকাতায় খোকন বহুবার বলেছে,

লুকিয়ে বাংলাদেশে যাওয়া কোনো ব্যাপারই নয়, কিন্তু যাবো না। যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো? খোকনের যুক্তি হচ্ছে, কাঁচা বয়সে একটা ভুলের জন্যে ক্ষমা তো চেয়েইছি, তার পরেও কেন চোরের মতো যাবো? গেলে মাথা উঁচু করে যাবো। এই ধরনের কথা বলার সময় ওর চোখে-মুখে যে তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণার ছবি ফুটে ওঠে তা থেকে আমরা স্পষ্ট দেখি যে দেশে স্বাধীনতা বিরোধীদের মাথায় তুলে রাখা হয়, ধর্ম নিয়ে ধর্মান্ধদের ব্যবসা করার সুযোগ দেয়া হয়, সেই দেশে আমি চোরের মতো লুকিয়ে যাবো? অসম্ভব!

একটা মানুষের কয়বার নির্বাসন হয়? ১৫ মার্চ, ২০০৫, কলকাতার 'সমান্তরাল' নামের সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী গুরুসদয় দত্ত রোডে ম্যাক্সমুলার ভবনে খোকনকে যে সংবর্ধনা দেয়, ওর ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র দেখায়, তাতে জিয়া ভাই, হেমা, রায়া ও আমি থাকতে পারিনি; ওই দিন বিকেলেই ঢাকা ফিরে আসি। ওখানে ছিলো আমার সেজো বোন সেলিনা হাই ঝর্না, তার স্বামী সৈয়দ আবদুল হাই, মাকিদ, ছোটবোন ফরিদা ফারুক হেনা, জাহিদ, আরিফ, আরিফের স্ত্রী কবিতা ও ছেলে, আমার আরেক বোনের মেয়ে রুপালি ও তার মেয়ে। ওই অনুষ্ঠানেই 'রাগ অনুরাগ'খ্যাত লেখক-সাংবাদিক শঙ্করলাল ভট্টাচার্য শুনেছি বলেছিলেন, 'পৃথিবীতে সাহিত্যের ইতিহাসে কোথাও নেই যে এক কবি দুই-দুইবার নির্বাসিত হন। দাউদ হায়দার তা-ই হয়েছে। প্রথমে ভারতে। পরে জার্মানিতে। এক দেশ থেকে আরেক দেশে, এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে।' এই দেশ-দেশান্তর নিয়েও ওর যে কবিতা, সেখানেও দেশ, বাংলাদেশ, জন্মদেশ বাংলাদেশ। কবিতার শিরোনাম 'এক নির্বাসন থেকে আরেক নির্বাসন' :

এক নির্বাসন থেকে আরেক নির্বাসন,
হয়তো কবির-ই জীবন
কিংবা আমার-

মধ্যরাতে চাঁদ ডাকে 'আয়, আয়'; দিনের
সূর্য বলে 'সবিতায়
মানুষ জন্ম নেই আর'

যে, আনন্দ নিয়ে জন্মেছিলাম, আমার দেশ
দেয়নি ফিরিয়ে
সে- প্রতিশ্রুতি।

তাই কি অপেক্ষা? নাকি কবির জীবন মানে
যীশুর আত্মাহুতি!

এপিটাফগুলি অক্ষরহীন, যুদ্ধ ভূমিতে যারা
বেঁচে আছে, বলি,
'ভালো থেকো রক্ত বাংলায়'

হে দেশ, তোমাকে ছেড়ে যতদূরেই যাই,
তুমি আছো সর্বাঙ্গে
জীবনে-সজল-অক্ষিলতায়।

১৪.০৯.১৯৮৭
বার্লিন

অন্নদাশঙ্করের ফ্ল্যাট বাড়িতে। পেছনে দাঁড়িয়ে বাম থেকে দাউদ, রশীদ, জিয়া

১৯৮৭ সালের মাঝামাঝি থেকে জার্মানিতে নির্বাসিত জীবন শুরু। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক গুন্টার গ্রাস ওকে জার্মানিতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। গুন্টার গ্রাসের মতো বিশ্বখ্যাত লেখক খোকনের জন্যে যে কী পরিমাণ চেষ্টা করেছিলেন, ভাবলে অবাক হতে হয়। মানবতা, মানবধর্ম চিরকালই সবকিছুর উর্ধ্বে, এই সত্য আবার প্রমাণ করলেন গ্রাস। একজন নির্বাসিত বিপন্ন কবিকে জার্মানিতে নিয়ে যাবার জন্যে তিনি খোদ জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলছেন, দাউদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।

১৯৮৭ সালের ১৪ মে তারিখে গুন্টার গ্রাস খোকনকে চিঠিতে লিখছেন- After explaining your difficulties, he (মি. গেন্‌শার, তৎকালীন জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী) asked for the letters you got and you have written in this case. And now all the materials is in Bonn. Mr. Genscher promised 'to do everything' what he is able to do. Now let's hope and wait.

দেশের বাইরে দুটি মানুষের কাছে খোকন পিতৃঋণে আবদ্ধ। ভারতে অন্নদাশঙ্কর রায়। জার্মানিতে গুন্টার গ্রাস। ভারতে আরো একজন ছিলেন। সাহিত্যিক-সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ। ১৯৭৪ সালে যখন শূন্য পকেটে খোকন কলকাতা পৌঁছায়, তখন গৌরকিশোর ঘোষই প্রথম তাঁকে আশ্রয় দেন।

কলকাতায় আরেক মহিলার কাছে খোকন মাতৃঋণেও ঋণী। লীলা রায়। অন্নদাশঙ্কর রায়ের স্ত্রী। আমেরিকান মহিলা; আসল নাম অ্যালিস ভার্জিনিয়া ওর্নডর্ফ। জন্ম টেক্সাস অঙ্গরাজ্যে। ব্রিটিশ ভারতের আইসিএস-এর ঘরণী। কিন্তু আমরা সবিস্ময়ে দেখেছি তিনি খোকনকে আদরে স্নেহে যত্নে যেন মা রহিমা খাতুন; জিয়া ভাই নিজে দেখেছেন শিশুর পেছন পেছন ঘুরে মা যেমন দুধ খাওয়ায়, তেমনি দিদু লীলা রায় 'ও দাউদ, দাউদ, দুধটুকু খাও। খাও!' বলে সাধছেন। বলছিলেন জিয়া ভাই, 'দিদুর ওরকম পেছন পেছন দুধ নিয়ে ঘোরা দেখে আমার কখন যে চোখ ভিজে গেছে জানিনে, দেখলাম, খোকনও দুষ্টু-দুরন্ত শিশুর মতো খাবো না খেতে ইচ্ছে করছে না বলছে, কিন্তু দিদু লীলা রায়? খাও! না খেলে শরীর ভালো থাকবে কি করে?'

অন্নদাশঙ্কর রায়ের চার ছেলেমেয়ে। বড় ছেলে প্রয়াত পুণ্যশ্লোক রায় বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ছেড়ে কলকাতায় এলেও থাকেন শ্বশুরবাড়িতে, ছোট ছেলে আনন্দরুপ রায়, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের বিরাট কর্মকর্তা, থাকছেন ওয়াশিংটনে। বড় মেয়ে জয়া উড়িষ্যায়, ছোট মেয়ে তৃপ্তি বম্বেতে। বুড়োবুড়ির কাছে কেউ নেই। অন্ধের যষ্ঠির মতো খোকন। লোকে বলতো অন্নদাশঙ্করের পঞ্চম সন্তান।

দাদু অন্নদাশঙ্কর রায় নেই, দিদু লীলা রায় নেই, কলকাতায় এখন আর কেউ ওর জন্যে অপেক্ষা করেন না; দাউদ কখন আসবে, দাউদ এখনও আসছে না কেন বলে উদ্বিগ্ন হতে। স্পষ্ট মনে আছে, দিদুর মৃত্যুর পর যেমন, দাদুর মৃত্যুর পরও তেমনি খোকন টেলিফোনে কথা বলতে পারছে না, আমি অনুভব করি একটি পিতৃমাতৃহীন শিশু যেন কিছু বুঝতে না পেরে ভাঙা গলায় জানিয়ে যাচ্ছে আমি এখন কার কাছে দাঁড়াবো, কে আমাকে দেবে আশ্রয়?

খোকনের জীবনটাকে আমার মেঘের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে হয়। শার্ল বোদলেয়ারের সবচেয়ে প্রিয় বিষয় ছিলো মেঘ, কারণ ওই মেঘ কোনো দেশের সীমারেখা মানে না, এ দেশ থেকে সে দেশে চলে যায় চলমান মেঘ;

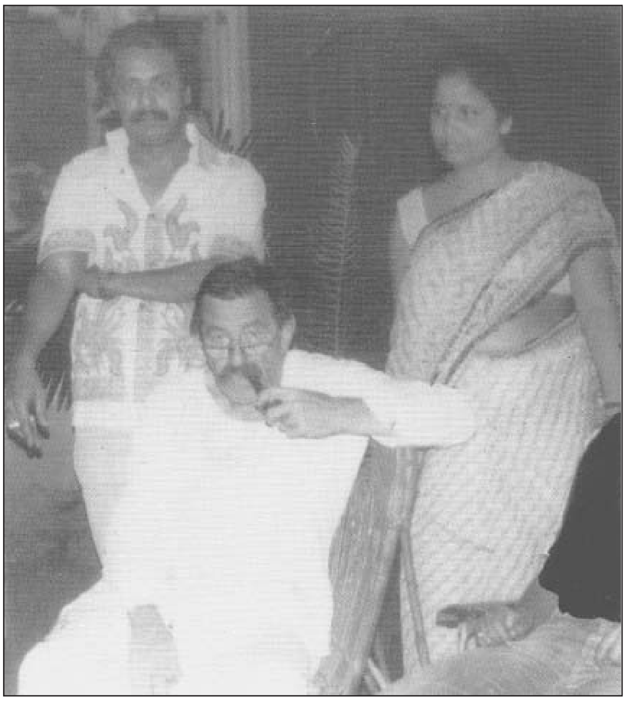

কলকাতায় গুন্টারগ্রাস, দাউদ ও তৃপ্তি ঘটক

চলিষ্ণু মেঘ। খোকনের জীবনটাও তীব্রভাবে চলমান। শুধু ছুটে চলা। দেশে নয়, বিদেশে। কলকাতায় অরুন্ধতী নামে একটি মেয়েকে ভালোবেসে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখলো; হলো না। একমাত্র অরুন্ধতী ছাড়া আর কাউকে গভীরভাবে ভালোবাসতে পারলো না; ফলে কলকাতা ও বার্লিনে ঘর হলেও সংসার হলো না। সংসার-জীবন সম্পর্কে নিজেই বলে, আমার যে-রকম বোহেমিয়ান স্বভাব, তাতে একটা মেয়েকে সংসারে এনে কষ্ট দিয়ে লাভ কি? জিজ্ঞেস করেছিলাম, অরুন্ধতী এলে কি করতি? দৃঢ় ও স্পষ্ট জবাব ছিলো, ওর কথা আলাদা। আমার নিজের বিবেচনায় খোকনের প্রথম ভালোবাসায় রয়েছে বাংলাদেশ, তারপরই মা, তারপরে আমার বড় মেয়ে হেমা, তারপরেই অরুন্ধতী। সাহিত্য তো আছেই।

বলছিলাম চলমান মেঘের কথা। ১৯৮৬ সালের গোড়ার দিকে ভারত সরকার খোকনকে দুই দিনের মধ্যে ভারত থেকে বহিষ্কারের চেষ্টা করলে সাংবাদিক এম. জে. আকবরের উদ্যোগে ও অন্নদাশঙ্কর রায়ের পরামর্শে এক চাঞ্চল্যকর বিবৃতি প্রকাশিত হয়। বিবৃতির শিরোনাম ছিলো : 'এতো বড় দেশ ভারত, সেউ দেশ কিনা একজন নির্বাসিত কবিকে আশ্রয় দিতে পারে না?' যতোদূর মনে পড়ছে বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়, সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, গৌরকিশোর ঘোষ, মহাশ্বেতা দেবী, ভবতোষ দত্ত, অম্লান দত্ত, নবনীতা দেব সেন, এম. জে. আকবর প্রমুখ। অন্নদাশঙ্কর রায় আরো এক ধাপ এগিয়ে, দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় নিবন্ধ লিখলেন, বললেন : দাউদকে যদি ভারত সরকার বের করে দেয়, তাহলে এর চাইতে অমানবিক কাজ আর হবে না। একজন বিপন্ন কবি, দেশে ফিরলে তার জেলবাস, হয়তো মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। তাকে সরকার বের করে দিতে পারে না। আজ যদি শ্রদ্ধেয় বন্ধুর কন্যা (ইন্দিরা গান্ধী) বেঁচে থাকতেন, তাহলে আমি তাকে সরাসরিই লিখতাম। এই লেখার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নিকট, দাউদের ভারতে থাকার অনুমতি দেবার অনুরোধ জানাচ্ছি।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের এই নিবন্ধটি আমি পরে পড়েছি, কলকাতায়। আশুতোষ চৌধুরী এভিনিউয়ে ফ্ল্যাট বাড়িতে শ্রীরায়ের সঙ্গে, পরিবারের সদস্যের অধিক হিসেবে খোকন ছিল দশ বছরের বেশি। এই লেখা পড়ে আমি শ্রীরায়কে জিজ্ঞেস করেছিলাম,

দাদু, ভারত সরকার যদি দাউদকে সত্যিই বের করে দিতো?

তাঁর তাৎক্ষণিক তীক্ষ্ণ জবাব ছিলো,

আমি আমৃত্যু অনশন করতাম।

তখন বাংলাদেশে ক্ষমতায় লে. জে. হু. মু. এরশাদ। সে সময় সাহিত্যিক বন্ধুদের মুখে রসিক মন্তব্যটি শুনেছি দাউদও কবি, এরশাদও কবি। দাউদের এতো নাম, আর সে প্রেসিডেন্ট হয়েও কবি খ্যাতি পাচ্ছে না, অসম্ভব! এই মন্তব্যের ভেতরেও একটা প্রচ্ছন্ন সত্য আছে। বেচারা এরশাদ! কবি হওয়ার জন্য কী না করেছেন!

কন্যা রায়া ও হেমার 'খোকন ছেলে'

শোনা কথা, খোকনকে 'অবাঞ্ছিত' করে রেখেছে এরশাদ সরকার। যদিও সরকারি ঘোষণা আমরা শুনিনি বা দেখিনি কিংবা সরকার আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়নি। একজন বৈধ নাগরিক 'অবৈধ' হয়ে থাকবে অথচ সরকার তা প্রকাশ করবে না, এটা কোন সরকারি নীতি আমাদের জানা নেই। কিন্তু কেন?

৩.

এবারই প্রথম যে কলকাতায় কলেজ স্ট্রিটে, বইপাড়ায় যাইনি। কলকাতায় গেছি বহুবার। কলেজ স্ট্রিটেও তাই। এবারে পাঁচটি দিন শুধুই খোকনের সঙ্গে থাকা। ঘোরাফেরা, পরিচিত দুই-একজনের বাড়ি যাওয়া। জিয়া ভাই, হেমা, রায়া ও আমি কলকাতা পৌছাই ১১ মার্চ, ২০০৫। এর পরদিন ঝর্না আপা, হাই ভাই, মাকিদ ও হেনা। ১৫ তারিখে আমরা যখন চলে আসছি তার ঠিক দেড়-দুই ঘন্টা আগে পৌছাল জাহিদ, আরিফ, রুপালী, কবিতা ও ওদের দুই সন্তান। যেন পুরো হায়দার পরিবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গেস্ট হাউসে। গেস্ট হাউসের এক কর্মী অবাক কণ্ঠে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনারা সবাই এক পরিবারের? তিনি যখন জানলেন, আমরা শুধু একজনকেই দেখতে গেছি তখন তিনি খানিকক্ষণ হা করে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। সেই কর্মীকে কি করে বোঝাই, দাদা, এ দেখা বড় কষ্টের দেখা। আমরা ফিরে যাবো স্বদেশে আর খোকন ফিরে যাবে বিদেশ বিভুঁইয়ে; যেখান থেকে শুধু স্মৃতিতে স্বদেশ দেখা যায়।

স্বদেশ যে খোকনের মনে ও চোখে কী গভীর রেখাপাত করে আছে; ১৯৭৭ সালে রচিত ওর 'যতদূরে, যেখানে' কবিতার মধ্য-অংশেই আছে

'তোমাকে ছেড়ে আমি বিশ্বের সমস্ত অলিগলি ঘুরলাম-
আমার মাথার উপরে চাঁদ উঠেছে খিলখিল
বিস্তর আকাশ জুড়ে ঝলমলে তারার চিৎকার.
সকালের ভ্রমণ গাড়িতে দূর উপত্যকার আশ্রয়;
কখনো-বা গ্রিসের প্রাচীন সভ্যতায়, দূরে ব্যাবিলনে, মিসরের পিরামিডে
রোমে। উজ্জ্বল ন্যুঅর্কে, শৌখিন প্যারিসে, বিধ্বস্ত বার্লিনে এবং
আমাদের
রক্তে নির্মিত লন্ডনে; যেখানে যত দূরেই যাই
তোমার কাছে এই আমাকে আবার ফিরে আসতেই হয়।'

খোকন সে জন্যই কি বাংলাদেশের মানুষ পেলেই পাগল হয়ে ওঠে; আর পূর্বপরিচিত আপনজন পেলে উন্মাদ? বাংলাদেশের বহু মানুষের সঙ্গে বার্লিনে খোকনের দেখা হয়েছে, অনেকেই দেশে ফিরে আমাদের কোনো ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলে বলেছেন দাউদের আন্তরিকতার কথা, আতিথেয়তার কথা, সঙ্গ দেবার কথা। বেশ কিছুদিন আগে প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বার্লিন থেকে ফিরে বলেছিলেন খোকনের কথা, তেমনি এই কিছুদিন আগেই সৈয়দ শামসুল হক গিয়েছিলেন বার্লিনে; তিনি বলছিলেন : আমি ভাইমার থেকে বার্লিন গেলাম। আগে থেকে দাউদকে জানাইনি, কিন্তু বার্লিন রেলস্টেশনে নেমেই দেখি দাউদ আমাকে রিসিভ করার জন্য দাঁড়িয়ে। যতোক্ষণ বার্লিনে ছিলাম দাউদ আমার সঙ্গ ছাড়েনি। আমাকে ওর ফ্ল্যাটে নিয়ে গেল, নিজে রেঁধে খাওয়ালো।

লালা রায় ও অন্নদাশঙ্করের সঙ্গে খোকন

আমি বলি, হক ভাই, খোকন বাংলাদেশের মানুষের মধ্যেই বাংলাদেশকে পেতে চায়। মাওলা ব্রাদার্স প্রকাশিত ওর 'নির্বাসনের কবিতা'র প্রায় প্রতিটি সৃষ্টিতেই বাংলাদেশ; পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক, সেখান থেকেই ও বাংলাদেশ দেখে। 'কালো সূর্যের কালো জ্যোৎস্নার কালো বন্যায়' নামে একটি কবিতা লেখার 'অপরাধে' আজ নির্বাসিত। কিন্তু ও তো দেশকে নির্বাসন দেয়নি! লিখছে :

'আমি তো ভাবি বাংলার জনগণ
আছে সাথে। আর যা-ই হোক
আমিও বাংলার লোক,
আমৃত্যু ধারণ করি খরা ও প্লাবন।

হে আমার দেশ
অশোক-পলাশে দাও জীবনের দীর্ঘ আবেশ'

(আমিও বাংলার লোক
১৮.০৯.১৯৮৯
ব্রাসেলস, বেলজিয়াম)

৪.

হাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রিটের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠার সময় ওর মুখের দিকে তাকাইনি। খোকন, আমি তাকাতে পারিনি! আমাদের ট্যাক্সি তোর চোখের আড়াল হওয়া পর্যন্ত কি তুই গাড়ির দিকে তাকিয়ে ছিলি?

আরও একটি প্রশ্ন : জানি, তোর কাছে বাংলাদেশের খানিকটা মাটি আছে। এখনও কি আছে? থাকলে কি করিস সে মাটি দিয়ে? ■